

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ মিনতী ঘরে বসে টিভি দেখছিল। একটি নাটকের দৃশ্য দেখতে পেল, সে একটি দেশের জনগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কিন্তু দেশের প্রশ্নে সবাই এক এবং অভিন্ন। সকলে মিলে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুদ্ধ করল এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করল। **◀ শিখনফল-১**

- ক. কবে ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামক পাশবিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়? ১
- খ. ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কি জান? ২
- গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির জাতীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যময় দিন’— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঘুমন্ত বাঙালির উপর “অপারেশন সার্চলাইট” নামক পাশবিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়।

খ ২৫ মার্চের গভীর রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাক হানাদার বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর এক ঘৃণ্য নিধনযজ্ঞ চালায়। একযোগে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ইপিআর হেডকোয়ার্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। একইভাবে গণহত্যা চলছিল পুরনো ঢাকায় কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে ও এ নিধনযজ্ঞ চালানো হয়। এভাবে সারা দেশকে পাক হানাদার বাহিনী সমাধি ক্ষেত্রে পরিণত করে।

গ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২ টার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দেন, “এটিই হয়ত আমার শেষ বার্তা” আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, যে যেখানে আছে, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়েই বুখে দাঁড়াও। সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।”

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। তাই বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেই বীর বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ঘ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির জাতীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যময় দিন।

মূলত ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরের পর থেকেই যৌথ বাহিনীর আক্রমণে পাক হানাদার বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে ১৬ ডিসেম্বর সকাল দশটায় পাকিস্তানি ১৪ ডিভিশন কমান্ডার জেনারেল জামশেদ ঢাকার মিরপুর ব্রিজের কাছে ভারতীয় জেনারেল নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেল ৪-২১ মিনিটে হানাদার বাহিনীর ইস্টন কমান্ডার অধিনায়ক লে. জেনারেল এ.এ. কে নিয়াজী ৯৩,০০০ সহযোগী সৈন্য নিয়ে মিএ ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জাগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাসের সংগ্রামের অবসান ঘটে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এদিন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সূচনা ঘটেছিল। বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। এ দিন বাঙালি জাতিয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটিত হয়। এদিন বাঙালি জাতি তার নিজস্ব স্বকীয় সত্তার ভিত্তি অর্জন করে। যা বাঙালি জাতির মর্যাদা বিশ্বদরবারের নিকট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এ দিন বাঙালি জাতি ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তার মাতৃভূমির প্রতি বন্দনা করার এক অনন্য সুযোগ লাভ করে। যা তাকে উন্নত জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। পরিশেষে বলা যায় যে, বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ২ গাজীপুরের কাউসার সাহেব নিজেকে ধন্য মনে করেন এজন্য যে, এ জেলার একজন মহান ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য যে সরকার প্রতিষ্ঠা করা/গঠিত হয়েছিল তার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গাজীপুরবাসী আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাদের প্রিয় নেতাকে স্মরণ করে।

◀ শিখনফল-২

- ক. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত কয়টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়? ১
- খ. ‘বাংলাদেশে স্বাধীনতায়ুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল’— বুঝিয়ে বলো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে মিল রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের এমন একটি সরকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘এ ধরনের সরকার গঠনের পরই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়’— বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

খ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল গণগণের তারকার ন্যায় দীপ্তমান।

পুরুষের পাশাপাশি বাংলাদেশের নারীরা লজ্জা, ভয় ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা অসীম সাহস দিয়ে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীরা মুক্তিসেনাদের খাবার, পানি, অস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ করে সহায়তা করে। পাশাপাশি আহত ও যন্ত্রণাকাতর মুক্তিসেনাদের সেবাপুশুয়া দিয়ে সুস্থ করে তোলে।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের মুজিবনগর সরকারের মিল বিদ্যমান।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত ছিল। আর এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গাজীপুরের তাজউদ্দিন আহমদ। মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের মানুষের প্রতি পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের করুণ চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে বৈদেশিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এছাড়া যেসকল তরুণ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের আশায় ভারতে ভিড় করে মুজিবনগর সরকার তাদেরকে যাচাই-বাছাই করে ভারতীয় ও বাংলাদেশি সেনাবাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রতিটি সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োগ করেন। এছাড়া এ সরকার কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। যা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রধান কার্যক্রম।

ঘ এ ধরনের সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠনের পরই বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠনের পর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র-জনতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে। মুজিবনগর সরকার এ বাহিনীর নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিলেই সমগ্র রণাঙ্গানকে ৪টি ভাগে ভাগ করেন। চট্টগ্রাম সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন মেজর জিয়া, কুমিল্লা সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ, সিলেট সেক্টরের মেজর শফিউল্লাহ এবং কুষ্টিয়া সেক্টরের মেজর আবু ওসমান। তবে ১১ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার সেক্টরগুলোকে নতুনভাবে পুনর্গঠন করে ১১টি ভাগে ভাগ করেন। অতঃপর ১৭ এপ্রিল সরকার শপথ গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং এ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন ওসমানী। আর চিফ অফ স্টাফ হিসেবে কর্নেল আব্দুর রব ও ডেপুটি চিফ হিসেবে স্কোয়াড্রন লিডার এ. কে. খন্দকারকে নিযুক্ত করা হয়। তাছাড়া নিয়মিত বাহিনীর ১১টি সেক্টরের প্রতিটিতে একজন করে কমান্ডার নিয়োজিত ছিল। প্রত্যেকটি সেক্টরকে আবার কয়েকটি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী গঠন করা হয়। অপরদিকে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে। এ বাহিনীর সদস্যদের দু'সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর একজন কমান্ডারের অধীনে তাদের নিজ এলাকায় গেরিলা পন্থাভিত্তিক যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

সুতরাং, উপরিস্থ আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, মুজিবনগর সরকার গঠনের পর বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়।

প্রশ্ন ৩ কীভাবে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল স্যার ছাত্রছাত্রীদের নিকট জানতে চাইলে মনীষা নিম্নলিখিতভাবে তা বর্ণনা করে।

‘কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগের পর তিনি নিয়মিত বাহিনীর সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নেন এবং ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলেন সেক্টর, ফোর্স বাহিনী, নিয়মিত সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী। পাশাপাশি স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠে অনিয়মিত বাহিনী, বেসামরিক বাহিনী ও গণবাহিনী।’

◀ পিছনফল: ২

- ক. মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কী নামে পরিচিত? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে আলোচিত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মনীষার আলোচিত অনিয়মিত বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল? মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘মুজিবনগর সরকার’ নামে পরিচিত।

খ মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিষয়ে বিশেষ দূত নিয়োগ করে। উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বহির্বিষয়ের সমর্থন ও জনমত আদায়। ১৯৭১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভায় আসেন। এরপর হতে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর দেশে ফিরে আসেননি। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তার মূল দায়িত্বই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বহির্বিষয়ে তৎপরতা চালানো। আর এ গুরু দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেন।

গ উদ্দীপকে আলোচিত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে স্থল বা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গড়ে তোলা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালের ৯ অক্টোবর ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার জলঢাকায় এক আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে ৬১ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন দেয়। এভাবেই শুরু হয়েছিল সেনাবাহিনীর যাত্রা এবং পরবর্তীকালে এসব অফিসাররা বিভিন্ন সেক্টরে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধে গতি সঞ্চার হয়।

নিয়মিত বাহিনী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীও গড়ে তোলা হয়। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে এ বাহিনী গঠিত হয়। ৯ নভেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে ৬টি দখলকৃত নৌযান নিয়ে প্রথম বঙ্গবন্ধু নৌবহরের উদ্বোধন করা হয়। যুদ্ধের শেষদিকে নৌবাহিনী গঠিত হলেও নৌপথে যুদ্ধ পরিচালনার কৃতিত্ব মূলত নৌকমান্ডো গেরিলাদের। এছাড়া গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারের প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয়। ১৮ জন পাইলট ও ৫০ জন বৈমানিক নিয়ে এ বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। বিমান বাহিনীর অনেক সদস্য স্থলযুদ্ধেও সাফল্যের পরিচয় দেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিয়মিত বাহিনীই মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ মনীষার আলোচিত অনিয়মিত বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয় যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে। এ বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল গণবাহিনী বা এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। এ বাহিনীর সদস্যদের দু'সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর একজন কমান্ডারের অধীনে তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এ বাহিনীর জন্য কোনো সামরিক আইন কার্যকর ছিল না। গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের কোনো বেতন-ভাতা দেওয়া হতো না। অনিয়মিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার। এ ছাড়াও উল্লিখিত বাহিনীর বাইরে আরও কয়েকটি অনিয়মিত বাহিনী ছিল। স্থানীয় ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে এসব গেরিলা বাহিনী গঠিত ছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে শেখ ফজলুল হক মণির নিয়ন্ত্রণাধীনে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। এ বাহিনীর সদস্যদের সকলে ছাত্রলীগের সদস্য ছিল। তন্মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখরা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুজিব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬,০০০। এ ছাড়া ন্যাপ (মোজাফফর), কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব দলীয় বাহিনী ছিল।

প্রশ্ন ৮ রশীদুল ইসলাম ২০১১ সালে অপহৃত হন তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামনে থেকে। তারপর অপহরণকারীরা মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করে রশীদুল ইসলামের পরিবারের নিকট। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানালে অপহরণকারীরা তাকে নিয়ে গহীন অরণ্যে পালিয়ে যায়। ১২ দিন পর রশীদুল ইসলাম শুনতে পান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাইকের আওয়াজ। তারা অপহরণকারীদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। ক্রমশ আওয়াজটা অনেক নিকটবর্তী হচ্ছে। মুক্ত হওয়ার উন্মাদনা চল্লিশ বছর পর রশীদুল ইসলামের মনে যেন আবারও জাগ্রত হলো। পার্থক্য এতটুকু সেদিন সমগ্র জাতির মনে স্বাধীন হওয়ার উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল আর আজ একাকী নিভূতে তার হৃদয়ে সেই অনুভূতি ক্ষণিকের জন্য ঊঁকি দিল।

◀শিখনফল: ৮

- ক. বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক কে ছিলেন? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় 'শান্তি কমিটি' বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. রশীদুল ইসলামের মনে চল্লিশ বছর পূর্বের যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল তা কোন জাতির স্বাধীন হওয়ার ইজ্জাত দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত জাতির শত্রুবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ভারত যৌথবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক ছিলেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

খ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় 'শান্তি কমিটি' বলতে বোঝায় মুক্তিযুদ্ধের সময় 'শান্তি কমিটি' নামক সংগঠনের বিরোধিতাকে।

জেনারেল টিক্কা খানের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে 'শান্তি কমিটি' গড়ে ওঠে ও বিস্তার লাভ করে। এ কমিটি অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিশ্বস্ত সহচরে পরিণত হয়। যাদের অংশগ্রহণ ও মদদে এ কমিটি গড়ে উঠেছিল তারা ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী। এ কারণে তারা পাকিস্তানিদের সাথে স্বাধীনতারবিরোধী তৎপরতায় অংশ নেয়।

গ রশীদুল ইসলামের মনে চল্লিশ বছর পূর্বের যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল তা বাঙালি জাতির স্বাধীন হওয়ার ইজ্জাত দেয়।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানিদের সাথে বাঙালি জাতির যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যৌথ বাহিনী পাকিস্তানিদের বিভিন্নভাবে ধরাশায়ী করে। ফলে তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে দিশেহারা হয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। বেতারে আত্মসমর্পণের খবর প্রচারিত হলে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর হাজার হাজার লোক 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে হাজির হয় রেসকোর্স ময়দানে। এছাড়া সারাদেশের মুক্তিকামী জনতা মুক্তির আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করে। তাদের মনে দীর্ঘ দিনের শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তির এক পরম অনুভূতির জাগ্রত হয়। এই অনুভূতিই রশীদুল ইসলামের অন্তরকে আবারো আলোড়িত করে। উদ্দীপকে রশীদুল ইসলাম অপহৃত হওয়ার পর গহীন অরণ্যে আবরুদ্ধ হন। পরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অপহরণকারীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ শুনে তার অন্তরে মুক্ত হওয়ার উন্মাদনা জাগে। তবে এ উন্মাদনা চল্লিশ বছর আগেও তার মনে জেগেছিল এই চল্লিশ বছর আগের মুক্তির আনন্দ মূলত ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির আনন্দেরই প্রতীকী রূপ।

সূতরাং বলা যায়, রশীদুল ইসলামের মনে জাগ্রত অনুভূতি বাঙালি জাতির স্বাধীন হওয়ার অনুভূতিরই ইজ্জাত।

ঘ উক্ত জাতি তথা বাঙালি জাতির শত্রুবাহিনী অর্থাৎ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

বাংলাদেশের যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘে যখন প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব, ভেটো চলছিল তখন বাংলাদেশের রণাঙ্গনে চলছিল তুমুল যুদ্ধ। পাকিস্তানি বাহিনী এ সময় চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ঢাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় পাকিস্তান আত্মসমর্পণকেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়।

বেতারে আত্মসমর্পণের খবর প্রচারিত হওয়ায় অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর হাজার হাজার লোক 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে হাজির হয় রেসকোর্স ময়দানে। পাকিস্তানি বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দলকে হাজির করা হয় বিজয়ীকে গার্ড অব অনার দেয়ার জন্য। এরপর বিকেল চারটা একুশ মিনিটে যৌথবাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেন। এর আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য জেনারেল নিয়াজি তার কোমরের বেষ্ট থেকে সুদৃশ্য রিভলবার ও ইউনিফর্মের কাঁধ থেকে লে. জেনারেল ব্যাজ খুলে লে. জেনারেল অরোরার হাতে তুলে দেন। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর সকল সদস্য ব্যাজ খুলে তাকে অনুসরণ করে। এ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিষয় অর্জিত হয়, বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তাই এটি আত্মসমর্পণ ঐতিহাসিক দলিল হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।



প্রশ্ন ▶ ১ গাজীপুরের কাউসার সাহেব নিজেকে ধন্য মনে করেন এজন্য যে, এ জেলার একজন মহান ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য যে সরকার প্রতিষ্ঠা করা/গঠিত হয়েছিল তার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গাজীপুরবাসী আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাদের প্রিয় নেতাকে স্মরণ করে।

◀ পিখনফল: ২

- ক. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত কয়টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়? ১
- খ. ‘বাংলাদেশে স্বাধীনতায়ুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল’— বুঝিয়ে বলো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে মিল রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের এমন একটি সরকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘এ ধরনের সরকার গঠনের পরই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়’— বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

খ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল গগণের তারকার ন্যায় দীপ্তমান।

পুরুষের পাশাপাশি বাংলাদেশের নারীরা লজ্জা, ভয় ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা অসীম সাহস দিয়ে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীরা মুক্তিসেনাদের খাবার, পানি, অস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ করে সহায়তা করে। পাশাপাশি আহত ও যন্ত্রণাকাতর মুক্তিসেনাদের সেবাপূর্ণা দিয়ে সুস্থ করে তোলে।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের মুজিবনগর সরকারের মিল বিদ্যমান।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত ছিল। আর এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গাজীপুরের তাজউদ্দিন আহমদ। মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের মানুষের প্রতি পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের করুণ চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে বৈদেশিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এছাড়া যেসকল তরুণ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের আশায় ভারতে ভিড় করে মুজিবনগর সরকার তাদেরকে যাচাই-বাছাই করে ভারতীয় ও বাংলাদেশি সেনাবাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে

১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রতিটি সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োগ করেন। এছাড়া এ সরকার কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। যা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রধান কার্যক্রম।

ঘ এ ধরনের সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠনের পরই বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠনের পর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র-জনতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে। মুজিবনগর সরকার এ বাহিনীর নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিলেই সমগ্র রণাঙ্গনকে ৪টি ভাগে ভাগ করেন। চট্টগ্রাম সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন মেজর জিয়া, কুমিল্লা সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ, সিলেট সেক্টরের মেজর শফিউল্লাহ এবং কুষ্টিয়া সেক্টরের মেজর আবু ওসমান। তবে ১১ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার সেক্টরগুলোকে নতুনভাবে পুনর্গঠন করে ১১টি ভাগে ভাগ করেন। অতঃপর ১৭ এপ্রিল সরকার শপথ গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং এ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন ওসমানী। আর চিফ অফ স্টাফ হিসেবে কর্নেল আব্দুর রব ও ডেপুটি চিফ হিসেবে স্কেয়াড্রন লিডার এ. কে. খন্দকারকে নিযুক্ত করা হয়। তাছাড়া নিয়মিত বাহিনীর ১১টি সেক্টরের প্রতিটিতে একজন করে কমান্ডার নিয়োজিত ছিল। প্রত্যেকটি সেক্টরকে আবার কয়েকটি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী গঠন করা হয়। অপরদিকে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে। এ বাহিনীর সদস্যদের দু’সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর একজন কমান্ডারের অধীনে তাদের নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

সুতরাং, উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, মুজিবনগর সরকার গঠনের পর বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়।

প্রশ্ন ২ কীভাবে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল স্যার ছাত্রছাত্রীদের নিকট জানতে চাইলে মনীষা নিম্নলিখিতভাবে তা বর্ণনা করে।

‘কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগের পর তিনি নিয়মিত বাহিনীর সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নেন এবং ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলেন সেক্টর, ফোর্স বাহিনী, নিয়মিত সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী। পাশাপাশি স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠে অনিয়মিত বাহিনী, বেসামরিক বাহিনী ও গণবাহিনী।’ ◀ *শিখনফল: ২*

- ক. মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কী নামে পরিচিত? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে আলোচিত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মনীষার আলোচিত অনিয়মিত বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল? মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘মুজিবনগর সরকার’ নামে পরিচিত।

খ মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত নিয়োগ করে। উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বহির্বিশ্বে সমর্থন ও জনমত আদায়। ১৯৭১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভায় আসেন। এরপর হতে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর দেশে ফিরে আসেননি। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তার মূল দায়িত্বই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বহির্বিশ্বে তৎপরতা চালানো। আর এ গুরু দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেন।

গ উদ্দীপকে আলোচিত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে স্থল বা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গড়ে তোলা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালের ৯ অক্টোবর ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার জলঢাকায় এক আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে ৬১ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন দেয়। এভাবেই শুরু হয়েছিল সেনাবাহিনীর যাত্রা এবং পরবর্তীকালে এসব অফিসাররা বিভিন্ন সেক্টরে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধে গতি সঞ্চার হয়। নিয়মিত বাহিনী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীও গড়ে তোলা হয়। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে এ বাহিনী গঠিত হয়। ৯ নভেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে ৬টি দখলকৃত নৌযান নিয়ে প্রথম বজ্রবন্দু নৌবহরের উদ্বোধন করা হয়। যুদ্ধের শেষদিকে নৌবাহিনী গঠিত হলেও নৌপথে যুদ্ধ পরিচালনার কৃতিত্ব মূলত নৌকমান্ডো গেরিলাদের। এছাড়া গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারের প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয়। ১৮ জন পাইলট ও ৫০ জন বৈমানিক নিয়ে এ বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। বিমান বাহিনীর অনেক সদস্য স্থলযুদ্ধেও সাফল্যের পরিচয় দেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিয়মিত বাহিনীই মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ মনীষার আলোচিত অনিয়মিত বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয় যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে। এ বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল গণবাহিনী বা এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। এ বাহিনীর সদস্যদের দু’সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর একজন কমান্ডারের অধীনে তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এ বাহিনীর জন্য কোনো সামরিক আইন কার্যকর ছিল না। গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের কোনো বেতন-ভাতা দেওয়া হতো না। অনিয়মিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার। এ ছাড়াও উল্লিখিত বাহিনীর বাইরে আরও কয়েকটি অনিয়মিত বাহিনী ছিল। স্থানীয় ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে এসব গেরিলা বাহিনী গঠিত ছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে শেখ ফজলুল হক মণির নিয়ন্ত্রণাধীনে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। এ বাহিনীর সদস্যদের সকলে ছাত্রলীগের সদস্য ছিল। তন্মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, নুরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখরা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুজিব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬,০০০। এ ছাড়া ন্যাপ (মোজাফফর), কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব দলীয় বাহিনী ছিল।

প্রশ্ন ৩ রশীদুল ইসলাম ২০১১ সালে অপহৃত হন তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামনে থেকে। তারপর অপহরণকারীরা মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করে রশীদুল ইসলামের পরিবারের নিকট। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানালে অপহরণকারীরা তাকে নিয়ে গহীন অরণ্যে পালিয়ে যায়। ১২ দিন পর রশীদুল ইসলাম শুনতে পান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাইকের আওয়াজ। তারা অপহরণকারীদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। ক্রমশ আওয়াজটা অনেক নিকটবর্তী হচ্ছে। মুক্ত হওয়ার উন্মাদনা চল্লিশ বছর পর রশীদুল ইসলামের মনে যেন আবারও জাগ্রত হলো। পার্থক্য এতটুকু সেদিন সমগ্র জাতির মনে স্বাধীন হওয়ার উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল আর আজ একাকী নিভুতে তার হৃদয়ে সেই অনুভূতি ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিল।

◀ *শিখনফল: ৮*

- ক. বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক কে ছিলেন? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় ‘শান্তি কমিটি’ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. রশীদুল ইসলামের মনে চল্লিশ বছর পূর্বের যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল তা কোন জাতির স্বাধীন হওয়ার ইজিত দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত জাতির শত্রুবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা- বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ভারত যৌথবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক ছিলেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা।

খ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় ‘শান্তি কমিটি’ বলতে বোঝায় মুক্তিযুদ্ধের সময় ‘শান্তি কমিটি’ নামক সংগঠনের বিরোধিতাকে। জেনারেল টিক্কা খানের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ‘শান্তি কমিটি’ গড়ে ওঠে ও বিস্তার লাভ করে। এ কমিটি অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিশ্বস্ত সহচরে পরিণত হয়। যাদের অংশগ্রহণ ও মদদে এ কমিটি গড়ে উঠেছিল তারা ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী। এ কারণে তারা পাকিস্তানিদের সাথে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতায় অংশ নেয়।

গ রশীদুল ইসলামের মনে চল্লিশ বছর পূর্বের যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল তা বাঙালি জাতির স্বাধীন হওয়ার ইজিত দেয়।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানিদের সাথে বাঙালি জাতির যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যৌথ বাহিনী পাকিস্তানিদের বিভিন্নভাবে ধরাশায়ী করে। ফলে তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে দিশেহারা হয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। বেতারে আত্মসমর্পণের খবর প্রচারিত হলে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর হাজার হাজার লোক ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে হাজির হয় রেসকোর্স ময়দানে। এছাড়া সারাদেশের মুক্তিকামী জনতা মুক্তির আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করে। তাদের মনে দীর্ঘ দিনের শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তির এক পরম অনুভূতির জাগ্রত হয়। এই অনুভূতিই রশীদুল ইসলামের অন্তরকে আবারো আলোড়িত করে। উদ্দীপকে রশীদুল ইসলাম অপহৃত হওয়ার পর গহীন অরণ্যে আবরুদ্ধ হন। পরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অপহরণকারীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ শুনে তার অন্তরে মুক্ত হওয়ার উন্মাদনা জাগে। তবে এ উন্মাদনা চল্লিশ বছর আগেও তার মনে জেগেছিল এই চল্লিশ বছর

আগের মুক্তির আনন্দ মূলত ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির আনন্দেরই প্রতীকী রূপ।

সূতরাং বলা যায়, রশীদুল ইসলামের মনে জাগ্রত অনুভূতি বাঙালি জাতির স্বাধীন হওয়ার অনুভূতিরই ইজিত।

ঘ উক্ত জাতি তথা বাঙালি জাতির শত্রুবাহিনী অর্থাৎ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

বাংলাদেশের যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘে যখন প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব, ভেটো চলছিল তখন বাংলাদেশের রণাঙ্গানে চলছিল তুমুল যুদ্ধ। পাকিস্তানি বাহিনী এ সময় চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ঢাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় পাকিস্তান আত্মসমর্পণকেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়।

বেতারে আত্মসমর্পণের খবর প্রচারিত হওয়ায় অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর হাজার হাজার লোক ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে হাজির হয় রেসকোর্স ময়দানে। পাকিস্তানি বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দলকে হাজির করা হয় বিজয়ীকে গার্ড অব অনার দেয়ার জন্য। এরপর বিকেল চারটা একুশ মিনিটে যৌথবাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেন। এর আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য জেনারেল নিয়াজি তার কোমরের বেল্ট থেকে সুদৃশ্য রিভলবার ও ইউনিফর্মের কাঁধ থেকে লে. জেনারেল ব্যাজ খুলে লে. জেনারেল অরোরার হাতে তুলে দেন। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর সকল সদস্য ব্যাজ খুলে তাকে অনুসরণ করে। এ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিষয় অর্জিত হয়, বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তাই এটি আত্মসমর্পণ ঐতিহাসিক দলিল হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৪ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনে যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিকামী মানুষের সমন্বয়ে যে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর সৃষ্টি হয় তাদের জন্য কোনো সামরিক আইন কার্যকর ছিল না। কাগজে-কলমে গেরিলা সেক্টর কমান্ডার দ্বারা পরিচালিত হলেও বাস্তবে এরা এলাকাভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত হতো।

◀ *শিখনফল-২*

- ক. স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সূচনা সংগীত হিসেবে কোন গানটি প্রচারিত হতো? ১
- খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে পরাজয়ের হাত থেকে কীভাবে রক্ষার চেষ্টা করেছিল? ২
- গ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত বাহিনীর পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত বাহিনীর অবদান মুক্তিযুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সূচনা সংগীত হিসেবে ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’ গানটি প্রচারিত হতো।

খ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সপক্ষে প্রথম থেকেই সমর্থন দিয়ে আসছিল। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের পরাজয়ের

আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে একের পর এক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ৪.৫ ডিসেম্বর এ প্রস্তাবে ভেটো দিলে ৭ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে তা স্থানান্তরিত হয়। ওই দিন ১৩টি সদস্য রাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির পক্ষে একটি প্রস্তাব দিলে ১৩১টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১০৪টি রাষ্ট্র তা সমর্থন করে। ভারত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে যুক্তরাষ্ট্র ১৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করে কিন্তু রুশ ভেটোর কারণে তা বাতিল হয়।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতার দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত অনিয়মিত বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

ঘ মুক্তিযুদ্ধে অনিয়মিত বাহিনীর ভূমিকা আলোচনা কর।